ভূমিকা

তাফসীরের সংজ্ঞাঃ

আভিধানিকভাবে শব্দটি (الفسر) 'ফাসার' শব্দ থেকে গৃহীত। যার অর্থ- ব্যাখ্যা করা, বর্ণনা করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: (وَلاَ يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْراً) অর্থ: "তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জবাব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।" (সূরা ফুরক্বান- ৩৩)

পরিভাষায়ঃ তাফসীর সেই ইলমের নাম যার মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ (ছা:)এর উপর নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাব বুঝা যায়, তার উদ্দেশিত অর্থ বর্ণনা করা হয় এবং তার হুকুম-আহকাম (বিধি-বিধান) বের করা সম্ভব হয়।

ইলমে তাফসীরের ফযীলতঃ

ব্যাপকভাবে এটি অতি সম্মানিত, সর্বোত্তম ও আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক পসন্দনীয় একটি বিদ্যা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবকে নিয়ে গবেষণা করতে ও তার অর্থ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা তার ভিত্তিতে আমল করে তাদের প্রশংসা করেছেন। তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এর মাধ্যমেই হেদায়াত, কল্যাণ ও রহমতের দ্বারা বান্দার জীবন প্রস্ফুটিত হবে।

ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন: 'যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে অথচ তার তাফসীর জানে না সে ঐ গ্রাম্য ব্যক্তির ন্যায় যে আবোল-তাবোলভাবে কবিতা আওড়ায়।'

মুজাহিদ বলেন: 'সৃষ্টির মধ্যে সেই লোক আল্লাহ্র কাছে বেশী পসন্দনীয়, যে নাযীলকৃত (কুরআন) সম্পর্কে বেশী জানে।'

তাফসীরের প্রয়োজনীয়তাঃ

বিভিন্ন কারণে মানুষ তাদের ইবাদত, আক্বীদা, আচার-আচরণ ও পারস্পারিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তাফসীরের মুখাপেক্ষী। তম্মধ্যে কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ:

১) কুরআন হল বালাগাতের (অলংকার শাস্ত্র) দিক থেকে অতি উঁচু মানের সাহিত্য। তাই অল্প শব্দ অধিক অর্থকে শামিল করে। আর তা সুস্পষ্ট করা জরুরী এবং অস্পষ্ট বিষয়কে উম্মোচিত করা আবশ্যক।

২) কুরআনের আয়াতগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের নিমিত্তে নাযিল হয়। তাই শানে নযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) না জানলে উহার অর্থও অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

৩) কখনো কুরআনের আয়াত বাহ্যিক অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ বহন করে। আর তা বর্ণনা করা জরুরী।

৪) কুরআনে কতিপয় বিধি-বিধান আছে, যা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয় যতক্ষণ না সুন্নাহ্ সর্ম্পকে জ্ঞান অর্জন হয়। অস্পষ্ট বিষয়কে সুন্নাহর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। আম বা ব্যাপক বিষয়কে সুন্নাহর মাধ্যমে খাছ বা বিশেষিত করা হয়।

মুফাস্সিরের সংজ্ঞাঃ

মুফাস্সির বা তাফসীরকারক সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যার মধ্যে মানবীয় সামর্থানুযায়ী কুরআনের অর্থ উম্মোচন ও বর্ণনা করার যোগ্যতা আছে।

মুফাস্সির হওয়ার শর্তাবলীঃ

আলেমগণ মুফাস্সির হওয়ার জন্য কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ:

১) আক্বীদাহ্-বিশ্বাস বিশুদ্ধ হতে হবে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে তার নিজস্ব আক্বীদার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। আক্বীদাহ্ যদি খারাপ হয় তবে তার ভিত্তিতে উক্তি সমূহের মধ্যে পরিবর্তন করবে, হাদীছ ইত্যাদি উল্লেখ করার ব্যাপারে খেয়ানত করবে। যে আয়াত সমূহ তার আক্বীদাহ্ বিরোধী হবে সেগুলোর সে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করবে, যাতে করে মানুষকে সালাফে সালেহীনের অনুসরণ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

২) প্রথমে কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করবে। কেননা কোথাও কোন বিষয় সংক্ষিপ্ত থাকলে হয়তো অন্য স্থানে তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন বিষয়ের বিধান আম বা ব্যাপক থাকলে হয়তো অন্য স্থানে তা খাছ বা বিশেষিত করা হয়েছে।

৩) কুরআনের তাফসীর সুন্নাহ্ থেকে অনুসন্ধান করবে। কেননা সুন্নাহ্ হল কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ও তাকে সুস্পষ্টকারী। এই কারণে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন: (أَلاَ إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ) অর্থ: "সাবধান! আমাকে কিতাব (কুরআন) এবং তার অনুরূপ আরেকটি বিষয় দেয়া হয়েছে।" আর তা হল সুন্নাহ্ বা হাদীছ। (আবূ দাঊদ)

৪) সুন্নাহর মধ্যে যদি তাফসীর না পাওয়া যায় তবে ছাহাবায়ে কেরামের উক্তি অনুসন্ধান করবে। কেননা তারাই সে ব্যাপারে অধিক জ্ঞান রাখেন- এই কারণে যে, তাঁরা কুরআন নাযিল হওয়ার অবস্থা ও প্রেক্ষোপট অবলকন করেছেন এবং এই কারণে যে, তাঁদের রয়েছে পূর্ণ অনুধাবন শক্তি, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সৎ আমল।

৫) তাফসীর যদি কুরআন বা সুন্নাহ্ বা ছাহাবীদের উক্তির মধ্যে না পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে অধিকাংশ ইমাম তাবেঈদের উক্তি গ্রহণ করেছেন। কেননা তাঁরা ছাহাবীদের থেকে তাফসীর শিখেছেন।

৬) আরবী ভাষা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়ের জ্ঞান রাখ। কেননা কুরআন আরবী ভাষাতেই নাযিল হয়েছে। মুজাহিদ বলেন: 'আল্লাহ্ এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কিতাব (কুরআনের) ব্যাপারে কোন কথা বলা (তাফসীর করা) বৈধ নয়- যদি তার আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে।' সুতরাং তার উপর ওয়াজিব হল, নাহু-ছরফ, বাক্য প্রকরণ, বাক্য বিন্যস ও বাক্যের সৌন্দর্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। সেই সাথে বালাগাতের তিনটি বিষয় রপ্ত করা যেমন: অর্থ, বর্ণনা ও সৌন্দর্য। যাতে করে কুরআনে কারীমের এ'জায (অলৌকিকতা) অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

৭) কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যা সমূহের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। যেমন: ইলমে ক্বিরাআত, ইলমে তাজবীদ, ইলমে উছূল, শানে নযূল, নাসেখ মানসূখ, মুত্বলাক মুক্বাইয়াদ প্রভৃতি।

৮) সুক্ষ্ম অনুধাবন শক্তি, যাতে করে মুফাস্সির একটি অর্থের উপর অপরটিকে প্রাধান্য দিতে পারে।

মাফাস্সিরের আদবঃ

১) তাঁর নিয়ত এবং উদ্দেশ্য সুন্দর হতে হবে। কেননা সকল আমলের বিশুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর শরীয়তী বিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে এই উদ্দেশ্য হওয়া জরুরী যে, তা দ্বারা ব্যাপক কল্যাণ সাধন করা ও ইসলামের সার্বিক উপকার করা।

২) উত্তম চরিত্রবান হওয়া। কেননা মুফাস্সির হল শিক্ষক বা শিষ্টাচারীর স্থানে। মানুষ তাঁর দ্বারা ততক্ষণ প্রভাবিত হবে না যে পর্যন্ত তিনি উত্তম চরিত্র ও আচরণে সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না করবেন।

৩) যা বলবেন সে অনুযায়ী আমল করবেন। যাতে করে তিনি হতে পারেন উত্তম নমূনা, মানুষ যার অনুসরণ করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলেমের নিকট থেকে মানুষ শিক্ষা অর্জন করতে বিরত থাকে এই কারণে যে, তার আচরণ-ব্যবহার ভাল নয়, সে যা বলে সে মোতাবেক আমল করে না।

৪) যে কোন উক্তি উল্লেখের ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা ও দৃঢ়তা অবলম্বন করা। সুতরাং কোন কিছু বলবে না বা লিখবে না যতক্ষণ সে ব্যাপারে সঠিক রেওয়ায়াত না পাবে।

৫) বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা। কেননা কঠোরতা মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

৬) আত্মসম্মান বোধ রক্ষা করা। আর আজেবাজে নিম্ন মানের কাজ কর্ম থেকে নিজেকে হেফাযত করা।

৭) সত্য প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ না করা এবং সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কাউকে ভয় না করা।

৮) সর্বক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা ও স্বীয় ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা। যাতে করে মুফাস্সিরের সাধারণ চলাফেরায়, পোশাক-আশাকে ও উঠা-বসায় একটা ধীরস্থীরতা ও ভাবগম্ভির্যতা লক্ষ্য করা যায়।

৯) যে কোন বিষয়ে নম্রতা, ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা ও তাড়াহুড়া পরিত্যাগ করা। সুতরাং যে কোন কথা উল্লেখের সময় ব্যাখাসহ সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করবে।

১০) সুন্দরভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ ও ভালভাবে তা পেশ করা। যেমন প্রথমে শানে নযূল, তারপর শব্দগত অর্থ বর্ণনা, তারপর বালাগাতের (অলংকার শাস্ত্র) বিভিন্ন দিক ও বৈকারণিক ব্যাখ্যা, তারপর আয়াতের ব্যাপক অর্থ পেশ, অত:পর উহা মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করবে। শেষে এ আয়াত থেকে কি কি বিধান পাওয়া যায় তার বর্ণনা করবে।

প্রশ্নমালা:

১) 'তাফসীরের' আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা লিখ।

২) তাফসীর শিক্ষা করার ফযীলত কি? মানুষ যে সব কারণে তাফসীরের মুখাপেক্ষী তার তিনটি কারণ উল্লেখ কর।

৩) মুফাস্সির কাকে বলে? তার মধ্যে কি কি শর্ত বর্তমান থাকতে হবে?

৪) মুফাস্সিরকে যে সকল আদব রক্ষা করতে হয় তম্মধ্যে ৫টি উল্লেখ কর।

অধ্যায়

ইলমে তাফসীরের সূচনা ও তার পর্যায় সমূহ

তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণ যে সকল নিয়ম নীতির অনুসরণ করেছেন সে সর্ম্পকে অবগত হওয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরী হল- লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'ইলমে তাফসীর' যে সকল পর্যায় অতিক্রম করেছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি আলোচনা পেশ করা।

'ইলমে তাফসীর' প্রধানত: দু'টি যুগ অতিক্রম করেছে। আর তা হল:

প্রথম যুগঃ রেওয়ায়াতের যুগ

এ যুগের সময় সীমা নববী যুগ থেকে শুরু করে ছাহাবায়ে কেরামের যুগ তারপর তাবেঈদের যুগ পর্যন্ত প্রলম্বিত। এ সময় সকল ইলম (ইসলামী জ্ঞান) রেওয়ায়াতের মাধ্যমেই পরস্পরের কাছে পৌঁছত। ছাহাবায়ে কেরাম নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে রেওয়ায়াত করতেন। কখনো তাঁরা পরস্পর থেকে বর্ণনা করতেন। তাঁদের পর এলেন তাবেঈগণ। তাঁরা ছাহাবীদের থেকে রেওয়ায়াত করতেন। তখনো তাঁরাও পরস্পর থেকে বর্ণনা করতেন। নিম্নে আমরা উল্লেখিত যুগের ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

ক) রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগে তাফসীরঃ

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন হেফাযত করার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ) "নিশ্চয় যিকির (কুরআন) আমি নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাযতকারী।" (সূরা হিজর- ৯) আর তিনি (আল্লাহ্) তাঁর নবীকে দায়িত্ব দিয়েছেন কুরআনকে ব্যাখ্যা করার এবং তার তাফসীর করার। আল্লাহ্ বলেন: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ) "আর আমি আপনার নিকট কুরআন নাযিল করেছি, যাতে করে আপনি মানুষের নিকট ব্যাখা করেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে করে তারা তা নিয়ে গবেষণা করতে পারে।" (সূরা নাহাল- ৪৪) এই কারণে ছাহাবায়ে কেরাম যখনই কুরআন বুঝার ব্যাপারে কোন অসুবিধার সম্মুখিন হতেন তখনই তাঁরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর স্মরণাপন্ন হতেন।

- নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কুরআনের তাফসীর কি পরিমাণ করেছেন, সে ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন: তিনি ছাহাবীদের জন্য পূরা কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। একথা বলেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:)। অন্যরা বলেছেন: তিনি কুরআনের খুবই অল্প ব্যাখ্যা ছাহাবীদের জন্য পেশ করেছেন। তবে প্রাধান্য যোগ্য কথা হল: তিনি কুরআনের অধিকাংশ তাফসীর করেছেন- পূরা কুরআনের নয় এবং তা অল্পও নয়।
- আর তাফসীরের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নীতি ছিল যে, তিনি আয়াতের তাফসীর দীর্ঘভাবে করতেন না অথবা এমন কথা বলতেন না যাতে কোন ফায়েদা নেই। তাঁর অধিকাংশ তাফসীর ছিল কোন সংক্ষিপ্ত বিষয়কে ব্যাখ্যা করা, অথবা কোন দুর্বোধ্য বিষয়ের সমাধান দেয়া, অথবা আম বা ব্যাপক কোন বিষয়কে খাছ বা বিশেষিত করা, অথবা কোন অর্থ বর্ণনা করা।

খ) ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)এর যুগে তাফসীরঃ

ছাহাবীগণ (রা:) ছিলেন প্রকৃত আরব জাতি। আরবী ভাষা এবং তার নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা খুব সহজে কুরআন বুঝতেন। কিন্তু যেহেতু কুরআনের ভাষাগত ও অলংকারগত মান সকল ভাষার উপরে, তাই কুরআনের অর্থ ও ভাব বুঝতে ও অনুধাবন করতে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দিত। তাঁদের কেউ এমন বিষয় তাফসীর করতেন যা অন্যের নিকট কঠিন ও জটিল মনে হত। কোন অর্থ যদি তাঁদের কাছে জটিল মনে হত এবং তাঁদের মধ্যে থেকেই কেউ তা ব্যাখ্যা করে দিবে এমন কোন ব্যক্তি না পেতেন, তখন তাঁরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করতেন। তখন তিনি তাদের জন্য তা ব্যাখ্যা করে দিতেন।

- **ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)এর তাফসীরের ক্ষেত্রে বিভিন্নতার কারণ কয়েকটিঃ**

১) বুঝ ও অনুধাবনের উপকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা। যেমন আরবীর ভাষাগত জ্ঞান।

২) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সাথে থাকা এবং তাঁর মজলিস সমূহে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে বিভিন্নতা।

৩) শানে নযূল সম্পর্কে জানার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য।

৪) শরঈ জ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য।

৫) বুদ্ধি ও মেধাগত দিক থেকে তাঁদের মধ্যে পার্থ্যক্য।

• কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে তাঁরা চারটি উৎসের উপর ভিত্তি করতেনঃ

ক) আল্ কুরআনুল কারীম, খ) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)বা তাঁর হাদীছ, গ) ইজতেহাদ ও গবেষণা, ঘ) আহলে কিতাবদের রেওয়ায়াত।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, কিভাবে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা, তারপর সুন্নাহ দ্বারা তারপর ইজতেহাদ বা গবেষণা দ্বারা করতে হয়। কিন্তু কুরআনের তাফসীর আহলে কিতাবের রেওয়ায়াত দ্বারা করার ব্যাপারে কথা হল, পবিত্র কুরআন কতিপয় বিষয়ে তাওরাত ও ইঞ্জিলের সাথে ঐক্যমত হয়েছে- বিশেষ করে নবীদের কিচ্ছা-কাহিনীর ক্ষেত্রে। তবে সে ক্ষেত্রে কুরআনের নীতি তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনরূপ নয়। কুরআন বিস্ত ারিত ও খুঁটিনাটি বর্ণনা দেয় নি। কিচ্ছাগুলো সকল দিক থেকে পূর্ণভাবে বর্ণনা করে নি। মানুষের মন যখন কিনা সর্বদা পূর্ণতা ও অনুসন্ধানের দিকে ধাবিত হয়, তাই কতিপয় ছাহাবী এ কিচ্ছাগুলোর বর্ণনা পূর্ণ করতে যেয়ে আহলে কিতাবের মধ্যে থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। যেমন- আবদুল্লাহ্ বিন সালাম, কা'ব আহবার প্রমূখ। তবে তাফসীরের ক্ষেত্রে ছাহাবীদের আহলে কিতাবের স্মরাণপন্ন হওয়ার তেমন কোন গুরুত্ব নেই, যেমন গুরুত্ব রয়েছে অপর তিনটি উৎসের ক্ষেত্রে। কারণ তাওরাত ও ইঞ্জিল ইহুদী খৃষ্টানদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। তাই ছাহাবীগণ তাদের থেকে শুধু তাই গ্রহণ করতেন যা তাদের আক্বীদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত এবং কুরআনের সাথে মতবিরোধ পূর্ণ হত না। যে বিষয়ের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হত তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করতেন গ্রহণ করতেন না। আর যে বিষয়ে নীরবতা পাওয়া যেত (অর্থাৎ তা অস্পষ্ট) তা তাঁরা শুনতেন কিন্ত তা সত্য না মিথ্যা কোন কথা বলতেন না। এক্ষেত্রে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর এ বাণীর উপর আমল করতেন:

(بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، من كذب علي متعمداً فاليتبوأ مقعده من النار)

"আমার নিকট একটি আয়াত হলেও তোমরা তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। বাণী ইসরাঈলদের থেকে হাদীছ বর্ণনা কর এতে কোন অসুবিধা

নেই। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়। (ছহীহ্ বুখারী)

- **এসমস্ত ইসরাঈলী খবর (রেওয়ায়াত) সাক্ষ্য স্বরূপ উল্লেখ করা যায় বিশ্বাস করার জন্য নয়।** এখবরগুলি তিন প্রকারের ঃ

১) আমাদের হাতে যা রয়েছে তার মাধ্যমে যার সত্যতা আমরা জানতে পেরেছি। তা ছহীহ বলে বিবেচিত।

২) যার মিথ্যা হওয়া আমাদের শরীয়ত দ্বারা জানতে পেরেছি। এই কারণে যে উহা আমাদের শরীয়তের বিরোধী। ইহা পরিত্যাজ্য।

৩) যে সম্পর্কে আমাদের শরীআত নীরব। অর্থাৎ যার সত্যাসত্য প্রমাণিত নয়। ইহা বর্ণনা করা যাবে- কোন সত্যায়ন বা মিথ্যায়ন ছাড়াই। আর এগুলোর অধিকাংশে কোন উপকার নেই। যেমন আছহাবে কাহাফ বা গুহাবাসীদের নাম, তাদের কুকুরটির রং, তাদের সংখ্যা, মূসা (আলাইহিস্সালামের) লাঠি, উহা কোন গাছের ছিল, ঐ সমস্ত পাখির নাম যাদেরকে আল্লাহ জীবিত করে ছিলেন ইবরাহীম (আলাইহিস্সালাম)কে দেখানোর জন্য ইত্যাদি।

*** তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভকারি ছাহাবীর সংখ্যা খুব কম ছিল।** তাঁরা কুরআন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন- নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে সরাসরী শুনে কিংবা মাধ্যম দিয়ে, অথবা তারা কুরআন নাযিলের যে প্রেক্ষাপট প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাদিয়ে, অথবা আল্লাহ তাদেরকে যে ইজতেহাদ–গবেষণার ক্ষমতা দান করেছিলেন তাদ্বারা। এঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবী হলেন দশজন। তাঁরা হলেনঃ চার খলীফা, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, উবাই বিন কাব, যায়দ বিন সাবেত, আবূ মূসা আশআরী, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)

এঁরা ব্যতীত অন্যান্য ছাহাবীগণও তাফসীর করেছেন, তবে তাঁদের থেকে বর্ণিত বিষয় খুবই নগণ্য। এদশ জন ছাহাবী কম ও বেশী তাফসীর বর্ণনার দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তরের। উক্ত দশজন ছাহাবীর মধ্যে থেকে অধিকহারে যারা তাফসীর বর্ণনা করেছেন তাঁরা ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপঃ ১) ইবনে আব্বাস, ২) ইবনে মাসউদ, ৩) আলী বিন আবূ তালিব। ৪) উবাই বিন কাব। বাকি ছয় জন সল্প বর্ণনার দিকে থেকে সমপর্যায়ের। ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে উল্লেখিত চার জন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

- **ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত তাফসীরের বিধানঃ**

ছাহাবীর তাফসীর দুই ভাগে বিভক্তঃ

১) তাফসীর যদি এমন হয় যার মধ্যে ইজতেহাদের কোন অবকাশ নেই, যেমন গায়েবী বা ভবিষ্যত সংক্রান্ত বিষয়, কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। এসব তাফসীর নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছের পর্যায়ভুক্ত, ইহা গ্রহণ করা ওয়াজিব।

২) তাফসীর এমন হয় যাতে ছাহাবীর ইজতেহাদ করার অবকাশ থাকে, তবে উহা ছাহাবীর উক্তি বলে পরিগণিত হবে- যতক্ষন তা রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকে সম্পর্কিত না করবে। কতিপয় আলেমে দ্বীন ছাহাবীর মাওক্বুফ হাদীছ গ্রহণ করা ওয়াজিব বলেছেন। কারণ তাঁরা বিভিন্ন অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের প্রত্যক্ষদর্শী। যা একমাত্র তাদের জন্য সম্ভব, অন্যদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

- **ছাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যুগে তাফসীরের বৈশিষ্টঃ**

১) সরলতা, এবং কাঠিন্য ও মতবিরোধের উর্ধে থাকা। সুতরাং হয় উহা কোন বাক্যের ব্যাখা হত অথবা আয়াত থেকে সংগৃহীত কোন বিধান হত।

২) তাঁদের তাফসীর কুরআনের সকল আয়াতের ক্ষেত্রে ব্যাপক ছিল না। বরং ঐসব আয়াতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল যে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে।

৩) সেকালে তাফসীর মৌখিকভাবে সংকলিত হত, তা লিখিত আকারে ছিলনা। যদিও কেউ কেউ কিছু লিখেছেন, কিন্তু তা ছিল ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টা মাত্র। সে যুগে (তাফসীর) লেখালেখির ব্যপকতা ছিল না।

৪) তাদের তাফসীর ইসরাঈলী বর্ণনা মুক্ত ছিল। কারণ বড়বড় ছাহাবী ছিলেন এর মূল রেফারেন্স। আর আহলে কিতাব হতে সদ্য ইসলাম গ্রহণ কারি মুসলিমদের তেমন মর্যাদা ও আসন ছিলনা, যাদ্বারা তাঁরা তাঁদের বর্ণনা প্রচার ও প্রসার করতে স্বক্ষম হতেন।

৫) ছাহাবী যুগের এই তাফসীর ফেক্বহী বিধি বিধান, হাদীছ, আক্বীদাহ, আচার আচারণ, তারগীব ও তারহীব (উদ্দীপন ও ভীতি প্রদর্শন) প্রভৃতি দ্বারা সংমিশ্রিত ছিল। কারণ সে যুগে ইসলামী জ্ঞান সমূহ স্বতন্ত্র আকারে বিভাজিত ছিল না।

গ) তাবেঈদের (রহঃ) যুগে তাফসীরঃ

তাবেঈ তাদেরকে বলা হয় যারা ছাহাবীদের হাতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, এবং তাদের থেকে অধিকাংশ জ্ঞান অর্জন করেছেন। (তাদেরকেও তাবেঈ বলা হয় যাঁরা ইমানের সাথে ছাহাবীদের সাথে

সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছেন এবং ঈমানের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেছেন। তাদের কাছে তারা শিষ্যত্ব বরণ করুন বা না করুন।-অনুবাদক)

তাবেঈদের যুগে তাফসীরের উৎস স্থলঃ

ক) কুরআন কারীম, খ) নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত (আল হাদীছ), গ) ছাহাবীদের ইজতেহাদ, ঘ) আহলে কিতাবের রেওয়ায়াত, ঙ) তদুপরি তাদের (তাবেঈদের) ইজতেহাদ ও গবেষণা।

পূর্বেই আমরা বলে এসেছি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত তাফসীর কুরআনের সকল আয়াতের ক্ষেত্রে ব্যপক ছিল না, বরং তাদের নিকট যেটা বুঝতে কঠিন হবে বলে অনুমিত হত তারই শুধু তাঁরা ব্যখা করেছেন। অত:পর নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগ হতে মানুষের দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে এই কাঠিন্য বৃদ্ধি হতে থাকে। সে কারণে তাবেঈগণ এই কাঠিন্যতা অনুপাতে তাফসীরের ক্ষেত্রে গবেষণা করতে বাধ্য হন।

এযুগে তাফসীরের কয়েকটি কেন্দ্র উদ্ভাবিত হয়। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবীদের যুগে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে দুনিয়ার বহু এলাকার উপর বিজয় দান করেন। তাই ছাহাবীগণ নির্দিষ্টভাবে এক দেশে বসবাস করেননি। তাঁরা ইসলামী দেশ সমূহের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। একারণে তাঁদের মধ্য থেকে কেউ হয়েছিলেন শাসক, কেউ মন্ত্রী, কেউ ক্বাযী, কেউ শিক্ষক প্রভৃতি। তাঁরা বিজীত ঐসমস্ত দেশে তাদের স্বস্ব ধারণ কৃত ইলম বহন করেছিলেন। তাঁদের সংশ্রবে এসে তাবেঈগণ ইলম অর্জন করতেন। এথেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে এসব শহরে (ইসলামী) জ্ঞান কেন্দ্র, যার শিক্ষক ছিলেন ছাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং ছাত্র ছিলেন তাবেঈগণ। এই মাদরাসাগুলোর মধ্যে থেকে কিছু মাদরাসা তাফসীরের দিক থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং কিছু মাদরাসা ফিক্বহের দিক দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাফসীরের দিক থেকে সুপ্রসিদ্ধ মাদরাসা ছিল তিনটি। তা হলঃ

১) মক্কা মুকার্‌রামাঃ এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর হাতে হয়েছিল। তাঁর শিষ্যদের অন্যতম ছিলেনঃ সাঈদ বিন জুবাইর, মুজাহিদ, ইকরিমা (ইবনু আব্বাসের ক্রিতদাস), তাউস বিন কায়সান আল ইয়ামানী, আত্বা বিন আবূ রাবাহ।

২) মাদীনা আল মুনাওয়ারাঃ ঐ সময় মদীনা ছিল খেলাফতে রাশেদার রাজধানী। ওমর (রাঃ) বিজ্ঞ সাহাবীদেরকে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মদীনা ত্যাগের

অনুমতি দিতেন না। যাতে করে তাঁরা তার মজলিশে শুরার তথা পরামর্শ বৈঠকের সদস্য ও তার উপদেষ্টার ভুমিকা রাখতে পারেন। এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠালাভ করে উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে। তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছাত্রদের অন্যতম হলেনঃ আবুল আলিয়া আররায়াহী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, মুহাম্মাদ বিন কাব আল কুরাযী, যায়দ বিন আসলাম প্রমূখগণ।

৩) কূফাঃ উক্ত প্রতিষ্ঠান আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)এর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ছাত্রদের অন্যতম হলেনঃ আলকামাহ বিন কাইস, মাসরূক ইবনুল আজদা', উবাইদাহ আস্ সালমানী, আল আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ, আমর বিন শুরাহবীল, আবূ আব্দুর রাহমান আস্ সুলামী, আমের আশ্শাবী প্রমূখগণ।

তাবেঈ কর্তৃক বর্ণিত তাফসীর গ্রহণের বিধানঃ

এবিষয়ে ইসলমী বিদ্বানগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেনঃ ইহা গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। কারণ তারা না রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছেন আর না তারা কুরআন নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন বা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং (কুরআনের) উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে যেয়ে তাদের ভুল ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া তাবেঈদের ন্যায় পরায়নতা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় যেমনটি ভাবে প্রমাণিত রয়েছে ছাহাবীদের ক্ষেত্রে। অন্য বিদ্বানগণ বলেনঃ তাবেঈদের তাফসীর গ্রহণযোগ্য। কারণ তাঁরা এই তাফসীর সরাসরী ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে নিয়েছেন, তাদের (ইলমী) বৈঠকে বসেছেন ও তাদের ইলম অর্জন করেছেন। তবে সব চেয়ে অগ্রাধিকার যোগ্য কথা হল এই যে,তাঁরা যদি কোন তাফসীরের ক্ষেত্রে ইজমা তথা ঐকমত্য পোষণ করেন তবে ঐ তাফসীর গ্রহণ করা ওয়াজিব, আর যদি তারা ভিন্ন মত পোষণ করেন তবে সে ক্ষেত্রে তাঁদের তাফসীর গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়, এবং তাদের একজনের কথা অপরজনের উপর দলীল হিসাবে প্রযোজ্য হবে না। এমতাবস্থায় কুরআনের ভাষার দিকে বা সুন্নাত তথা হাদীছের দিকে বা আরবদের সাধারণ ভাষা বা ছাহাবীদের কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তাবেঈদের যুগে তাফসীরের বৈশিষ্টঃ

১) ইহুদ-খৃষ্টানদের অনেকে ইসলামে প্রবেশ করার কারণে তাদের তাফসীরে ইসরাঈলী বর্ণনার অনুপ্রবেশ।

২) বিজয় লাভের মাধ্যমে ইসলামী রাজ্য বিস্তার লাভের সাথে সাথে অনেক অনারবের ইসলামে দিক্ষা লাভ করায় বহু সংখক আয়াতের তাফসীর করার

প্রয়েযাজন দেখা দেয়। তাই তাবেঈগণ মানুষের প্রয়োজনানুপাতে তাফসীর বর্ধিত করতে থাকেন। তাঁরা এযুগে তাফসীরের কাজ সম্পন্ন করেন। এভাবেই সমূদয় কুরআনের তাফসীর সুসম্পন্ন হয়।

৩) এ যুগে তাফসীর পূর্বসূরীদের (ছাহাবীদের থেকে) থেকে গ্রহণ ও বর্ণনা দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল।

৪) ছাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যুগের তুলনায় এযুগে তাফসীরী মতবিরোধ বেশী পরিলক্ষিত হয়। এক আয়াতের ক্ষেত্রেই অনেক কথা ও তাফসীর পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য উক্তি গুলি প্রায় পরস্পরের নিকটবর্তী ও সমার্থবোধক। সেকারণ বলা যায় যে, এগুলো ভাষাগত তারতম্য মাত্র, পরস্পর বিরোধ পূর্ণ তারতম্য নয়।

৫) এ যুগে তাফসীর সনদ (সূত্র) সহ বর্ণনা করা হত। প্রত্যেক কথা সূত্র সহ তার কথক পর্যন্ত সম্বন্ধ করা হত, যাতে করে সবল কথাকে দুর্বল কথা থেকে পৃথক করা যায়।

দ্বিতীয় যুগঃ তাফসীর লিপিবদ্ধ করণের যুগঃ

তাফসীর লিপিবদ্ধ করণের সূচনা হয় তাবেঈদের শেষ যুগের দিকে (বনী উমাইয়াদের শাসনামলের শেষের দিকে ও আব্বাসীদের শাষনামলের প্রথম দিকে।) এযুগকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। তা হলঃ

ক) হাদীছের সাথে মিলিয়ে তাফসীর লিপিবদ্ধ করণ। কেননা হাদীছই সর্বপ্রথম লিপি বদ্ধ ও সংকলিত করা হয়। সেই সংকলন বিভিন্ন অধ্যায়কে শামিল করে, যার অন্যতম অধ্যায় ছিল এ তাফসীর । তাফসীরের জন্য আলাদা নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়নি, যাতে কুরআনের প্রত্যেকটি সূরা ও আয়াতের সতন্ত্র ভাবে তাফসীর করা হয়।

খ) সতন্ত্রভাবে তাফসীরের পুস্তক রচনাঃ আল কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের তাফসীর তার বিন্যাস অনুপাতে করা হয়। ইহা সতন্ত্রভাবে আলাদা একটি বিদ্যা (ইলমে তাফসীর) হিসেব প্রতিষ্ঠা রাভ করে যা 'ইলমে হাদীছ' পৃথক হয়ে যায়। সর্ব প্রথম যাঁরা তাফসীরকে সতন্ত্র ভাবে লিখেন তাঁরা হলেনঃ
ইবনু মাজাহ্ (মৃত্যুঃ ২৭৩) ইবনুজারীর আত্ব ত্বাবারী (মৃত্যুঃ ৩১৮), ইবনু আবী হাতিম (মৃত্যুঃ ৩২৭) আবুশ্ শাইখ ইবনু হিব্বান (মৃত্যুঃ ৩৬৯ হি:) হাকিম (মৃত্যুঃ

৪০৫হি:) আবূ বাকর ইবনু মারদুওয়াইহ (মৃত্যুঃ ৪১০হি:) তাঁদের তাফসীর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), তাবেঈন, তাবে তাবেঈন পর্যন্ত সনদ (সূত্র) সহকারে সংকলিত। কোন কোন সময় বর্ণিত মতামত সমূহে (লেখকের পক্ষ থেকে) প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আরো রয়েছে তাদের তাফসীরে বিভিন্ন বিধি বিধানের আবিস্কার, প্রয়োজনের সময় ইরাব তথা যের যবর প্রভৃতি দেয়া হয় বা ব্যাকারণগত ব্যাখ্যা পেশ করা হয়। তাই তাদের তাফসীর বর্ণনা ভিত্তিক ছিল।

গ) বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর থেকে সনদ বাদ দেয়া। তারা সনদকে সংক্ষিপ্ত করেন। বিভিন্ন মতামত কারো দিকে সম্পৃক্ত করণ ছাড়াই একত্রিত করেন। যার ফলে হযবরলতা পরিলক্ষিত হয়। মনগড়া ও দূর্বল কথার অনুপ্রবেশ ঘটে। অশুদ্ধ বর্ণনা হতে বিশুদ্ধ বর্ণনার কোন পার্থক্য করা হয়নি।

ঘ) তাফসীর বির্ রায়। এরপর তাফসীর বিল মাসূর তথা সালাফে ছালেহীন থেকে বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীরের উপর ক্ষান্ত না হয়ে তা বিবেক প্রসূত তাফসীরের দিকে অগ্রসর হয়। এপ্রকার তাফসীরকে "তাফসীর বির্ রায়" বলে।

ঙ) ইসলামী সম্রাজ্য বিস্তার লাভের সাথে সাথে ফিক্বহ ও আক্বাইদ সম্পর্কিত মাযহাবের সৃষ্টি হয়, মতবিরোধ বৃদ্ধি লাভ করে। তর্ক বিদ্যার ছড়াছড়ি শুরু হয়। মাযহাবী গোঁড়ামী আত্ম প্রকাশ করে, বিবেক প্রসূত দর্শন বিদ্যা বর্ণনা ভিত্তিক বিদ্যার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যায়। মুফাস্সিরগণ তাঁদের তাফসীরে ব্যক্তিগত মতের উপর নির্ভর করতে শুরু করে, তাদের মধ্যে ইলমী পরিভাষা ও মাযহাবী বিশ্বাস সমূহ জেঁকে বসে। প্রত্যেকে স্বীয় তাফসীরকে ঐ সব বিষয় দিয়ে ভরে দেয় যে বিসয়ে তার নিজস্ব বুৎপত্তি রয়েছে। এজন্যই আকল প্রসূত বিদ্যার অধিকারীর তাফসীরে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের কথা প্রধান্য পেয়েছে। যেমন ফাখরুদ্দীন রাযীর তাফসীর। ফিক্বাহবিদদের উপর ফিকাহ প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন জাসসাস, ক্বুরতুবী প্রমূখগণ। অনুরুপ ভাবে ইতিহাসবিদের তাফসীরে কিছ্ছা কাহীনি ও খবর প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন, সালাবী, খাযিন প্রমূখদের তাফসীর। বিদআত পন্থীগন আল্লাহ্র কালামের বাখা তাদের বাতিল মাযহাব মুতাবিক করতে শুরু করে। যেমন রুম্মানী, জুব্বাই, ক্বাজী আব্দুল জাব্বার, মুতাযিলা ফির্কার যামাখশারী, ইসনা আশারী শীআ দলের আল্ কাশী, তাসাউফ পন্থী তথা সূফী যেমন ইবনে আরাবী ইঙ্গিত সুচক অর্থ নিজ মাযহাব মুত্বাবিক বের করে।

এতদাসত্বেও রয়েছে, ইলমে নাহু (আরবী ব্যাকরণ) ও বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) সম্পর্কিত তাফসীর। এভাবেই তাফসীরের কিতাব সমূহ শুদ্ধ-অশুদ্ধ ও ভাল-মন্দ সব রকম বিষয় বহন করতে শুরু করে। প্রত্যেক মুফাস্সির (স্বস্ব মাযহাব অনুযায়ী) আয়াত সমূহকে এমন বিষয়ের উপর প্রজোয্য করেছেন যার উপর মূলত: ঐ আয়াত গুলি প্রজোয্য হবার নয়। ইহা মূলতঃ স্বীয় মাযহাবকে জয়যুক্ত করার জন্য ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কল্পে করা হত। (এভাবেই বিদআত পন্থী মুফাস্সিরদের নিকট) তাফসীর তার আসল উদ্দেশ্য তথা মানুষকে হিদায়াত, দিক নির্দেশনা ও দ্বীন ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট হারিয়ে ফেলে। এভাবেই 'তাফসীর বির্ রায়' বা বিবেক প্রসূত তাফসীর 'তাফসীর বিল মা'ছূর' বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীরের উপর আক্রমন করে। পরবর্তী যুগ সমূহেও তাফসীরের এ ধারা অব্যাহত থাকে।

চ) আধুনিক যুগের তাফসীর: আধুনিক যুগের তাফসীরে নতুন পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। এযুগের মুফাস্সিরগণ যুগের প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তাফসীরে তারা এমন সব বিষয় উল্লেখ করেন যা আল কুরআনে শামিল হয়েছে। যেমন- সামাজিক জীবনের ভিত্তি, ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান ও অন্যান্য ইলমের মূল উৎস। এক্ষেত্রে তাফসীরুল জাওয়াহির, তাফসীরুল মানার ও তাফসীর যেলালুল কুরআন স্ববিশেষ উল্লেযোগ্য।

প্রশ্ন মালা

১) সমস্ত ইলম্ বিশেষ করে ইলমে তাফসীর দুটি যুগ অতিক্রম করেছে, এদুটি যুগের উল্লেখ কর। প্রত্যেকটি যুগ কখন থেকে শুরু হয়? প্রত্যেকটি যুগের বৃহৎ বৈশিষ্টগুলি কি কি?

২) বর্ণনার যুগ তিনটি স্তরে বিভক্ত। স্তরগুলি উল্লেখ কর।

৩) ছাহাবায়ে কেরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যুগের তাফসীর সম্পর্কে কিছু আলোকপাত কর।

৪) ইসরাঈলী বর্ণনার ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তির কি ভূমীকা হওয়া চাই?

৫) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে তাফসীরের কিছু বৈশিষ্ট উল্লেখ কর।

৬) ছাহাবী ও তাবেঈ কর্তৃক বর্ণিত তাফসীরের বিধান কি উল্লেখ কর।

৭) তাফসীরের মাদরাসা (প্রতিষ্ঠান) বলতে কি বুঝায়? এগুলি কখন প্রকাশ লাভ করে? প্রত্যেক মাদরাসার দুজন শিক্ষকের নাম ও তিন জন ছাত্রের নাম উল্লেখ কর। মাদরাসাদ্বয় কোথায় অবস্থিত?

সূরা নছরের তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

সরল বঙ্গানুবাদঃ

১) যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, ২) আর মানুষকে আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখতে পাবেন। ৩) তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

শানে নুযূলঃ

এই সুরাটি সূরা তাওবার পর বিদায় হজ্জের সময় মিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইহাই কুরআনের সর্বশেষ নাযিল কৃত সূরা।

সুরাটি নাযিলের উদ্দেশ্যঃ

উক্ত সূরায় রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর পবিত্র আত্মার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে হযরত ওমর (রা:) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বয়বৃদ্ধদের সাথে মজলিসে শূরায় প্রবেশ করাতেন। সে কারণে তাঁদের কেউ যেন মন ক্ষুন্ন হলেন এবং বললেন: এ কেন আমাদের সাথে প্রবেশ করছে অথচ আমাদেরও তো তার মত ছেলে সন্তান আছে? তখন ওমার (রা:) বললেনঃ আপনারা তো জানেন সে কাদের দলভুক্ত। তাই কোন একদিন আমাকে তিনি ডাক দিলেন অত:পর তাদের মাঝে পাঠালেন। সে সময় আমার ইহাই ধারণা হয়েছিল যে, আমাকে ওমার (রা:) সেদিন শুধু এ জন্যই ডেকেছিলেন যে, তিনি তাদেরকে আমার যোগ্যতা দেখাবেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ إذا جاء نصر الله والفتح (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে) মহান আল্লাহর উক্ত বাণী সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? উত্তরে তাদের কেউ বললেন: এ সূরায় আল্লাহ্ আমাদেরকে তার প্রশংসা ও তার নিকট ক্ষমা তলব করতে নির্দেশ দিয়েছেন- যখন তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন ও বিজয় দান করবেন।

তাদের মধ্যে কেউ নীরব থাকলেন, কিছুই বললেন না। এবার ওমার (রা:) আমাকে বললেনঃ হে ইবনে আব্বাস! তুমিও কি অনুরুপ বল? আমি বললাম: "না"। তিনি বললেনঃ তবে তোমার কথা কি? আমি বললাম, ইহা আল্লাহ্‌র রাসূলের মৃত্যু বরণের সময়, যা তিনি তাকে জানিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ (إذا جاء نصر الله والفتح) (যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে) অর্থাৎ ইহা হল, আপনার মৃত্যু সময়ের আলামত। (তাই আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবূলকারী।) ওমার বিন খাত্তাব বললেন ঃ এর ব্যাখ্যায় তুমি যা বলেছ তা ছাড়া আমি অন্য কিছু জানি না। (ছহীহ্ বুখারী)

আয়েশা (রা:) বলেনঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ জীবনে বেশী বেশী এই দু'আটি বলতেনঃ (سبحان الله وبحمده، استغفرالله وأتوب إليه) সুবহানাল্লাহে ওয়াবে হামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহে। আর তিনি বলেন: আমার পালনকর্তা আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে আমি অচিরেই কিছু আলামত দেখতে পাব। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, উহা দেখতে পেলে আমি যেন তাঁর প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করি ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। আর আমি তা দেখেছি: (إذا جاء نصر الله والفتح) "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।" (ছহীহ্ মুসলিম)

শব্দ সমূহের অর্থ:

শব্দ :	অর্থ :
الفتح	অর্থাৎ- মক্কা বিজয়।
أفْوَاجاً	অর্থাৎ- দলে দলে।

সূরার সাধারণ অর্থ:

জেনে রাখুন (হে রাসূল!) যে মক্কা আপনার পূর্ব ঠিকানা যা থেকে আপনাকে বের করে দেয়া হয়েছে, তা যখন আপনি বিজয় করবেন। আর আল্লাহ্‌র দ্বীনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করবে। তখন মনে করবেন দুনিয়াতে আপনার দ্বারা আমার কাজ শেষে হয়েছে। সুতরাং আপনি আমার কাছে চলে আসার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। কেননা দুনিয়ার চাইতে আখেরাত আপনার জন্য উত্তম ও মঙ্গল জনক। আর অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমন কিছু প্রদান করবেন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

এ সূরা থেকে শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. আল্লাহ্‌র সাহায্য, মক্কা বিজয়, আল্লাহর দ্বীনে মানুষের প্রবেশ ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ তাঁর রাসূলকে সুসংবাদ প্রদান। আর এ সুসংবাদগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে।

২. সাহায্য এবং বিজয় লাভের পর রাসূল (ছা:)কে আল্লাহর নির্দেশ- তাঁর শুকরিয়া আদায়, প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার।

৩. একথার প্রতি ইঙ্গিত যে, এ দ্বীনের প্রতি আল্লাহর সাহায্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।

৪. একথার প্রতি ইঙ্গিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (ছা:)এর আয়ুস্কাল ফুরিয়ে এসেছে।

প্রশ্নমালাঃ

১) সূরা 'নছর' কখন নাযিল হয়?

২) সূরা নছর নাযিল করার উদ্দেশ্য কি?

৩) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ কি: الفتح ، أفواجاً

৪) এ সূরা থেকে দুটা শিক্ষণীয় দিক উল্লেখ কর।

সূরা কাফেরূনের তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

সরল বঙ্গাবনুবাদঃ

১) বলুন! হে কাফের সম্প্রদায়, ২) তোমরা যার ইবাদত কর আমি তৰ ইবাদত করি না। ৩) তোমরাও ইবাদতকারী নও যার আমি ইবাদত করি ৪) আর আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর। ৫) তোমরা ইবাদতকারী নও যার আমি ইবাদত করি। ৬) তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আমার দ্বীন আমার জন্য।

শানে নযূলঃ

কুরায়শদের কাফের সম্প্রদায় মুর্খতার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আহবান করল- তিনি এক বছর তাদের মূর্তির পূজা করবেন, আর তারাও তাঁর মা'বূদ (আল্লাহ্র) এক বছর ইবাদত করবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেন এবং তাঁর রাসূলকে আদেশ করেন- তিনি যেন তাদের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেন।

কখন সূরাটি পাঠ করা সুন্নাত?

১) তওয়াফ শেষে দু'রাকাআত ছালাতের প্রথম রাকাআতে। জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সূরাটি এবং ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাছ) তওয়াফ শেষের দু' রাকাআতে পাঠ করতেন। (মুসলিম)

২) ফজর এবং মাগরিবের সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকাআতে। আর দ্বিতীয় রাকাআতে পড়তে হয় সূরা ইখলাছ। ইবনু ওমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের পূর্বের দু'রাকাআতে এবং মাগরিবের পরের দু'রাকাআতে বিশের অধিকবার বা দশের অধিকবার পাঠ করেছেন- "ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরূন" এবং "ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ"। (আহমাদ)

৩) নিদ্রার পূর্বে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যখন শয্যা গ্রহণ করবে তখন পাঠ করবে "ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরূন"- শেষ পর্যন্ত তা পাঠ করবে। কেননা উহা শির্ক থেকে মুক্ত ঘোষণা। (ত্বরাণী)

সূরাটির ফযীলত:

১) আগের হাদীছটির মর্মার্থ অনুযায়ী সূরাটির মাধ্যমে শির্ক থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়।

২) সূরাটির কুরআনের এক চতুর্থাংশের বরাবর। ইবনু ওমার (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরূন" সূরাটি কুরআনের এক চতুর্থাংশের বরাবর। (ত্বাবরাণী ও হাকেম, সনদ ছহীহ)

শব্দ সমূহের অর্থ:

শব্দ :	অর্থ :
قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ	এখানে কাফেরদের সকল সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে।
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ	আমি ইবাদত করি না তোমাদের মূর্তি এবং শরীক সমূহের।
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ	আমি যে আল্লাহ্র ইবাদত করি তোমরাও তার ইবাদত কর না। কেননা আল্লাহ্র জন্য তোমাদের ইবাদত শির্ক মিশ্রিত, যাকে ইবাদতই বলা চলে না।
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ	আমি তোমাদের ইবাদতের মত ইবাদত করি না, সে পন্থা অবলম্বন করি না এবং তার অনুসরণ অনুকরণও করি না। আমি একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করি সেই পন্থায় যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

সূরার সাধারণ অর্থ:

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে, তিনি যেন সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভাবে কাফেরদের সামনে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে প্রকাশ্যে গোপনে তারা যাদের ইবাদত করে থাকে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহর ইবাদতে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা না থাকার কারণে তারা আল্লাহর ইবাদতই করে না। শির্কের সাথে মিশ্রিত তাদের ইবাদতকে কোন

ইবাদতই বলা চলে না। একথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে প্রথম কথা তাদের কর্মের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির উপর প্রমাণ বহণ করে। আর দ্বিতীয় কথা একথার উপর দলীল বহণ করে যে, এটা একটা আবশ্যক বিষয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা দু'দলের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করে দিয়েছেন: (لكم دينكم ولي دين) "তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আমার দ্বীন আমার জন্য।"

এ সূরা থেকে যে শিক্ষা লাভ করা যায়:

১) এককভাবে আল্লাহ্র জন্য ইবাদতকে খালেছ বা একনিষ্ঠ করা ওয়াজিব।

২) শির্ক এবং তার অনুসারীদের থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করা অতি আবশ্যক।

৩) যারা বিভিন্ন ধর্মের মাঝে দূরুত্ব কমিয়ে পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়ার দাওয়াত দেয় তাদেরকে প্রতিবাদ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামই একমাত্র হক ধর্ম। তা ছাড়া অন্যান্য সকল ধর্ম বাতিল।

৪) ইমাম শাফেয়ী (র:) (لكم دينكم ولي دين) "তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আমার দ্বীন আমার জন্য।" এআয়াতটি থেকে এ দলীল নিয়েছেন যে, সকল কাফেরের ধর্ম একই। তাই ইহুদী এবং খৃষ্টানের মাঝে যদি বংশের সম্পর্ক বা অন্য কোন কারণ থাকে তবে তারা পরস্পর মীরাছ লাভ করতে পারবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (র:) বলেন: তারা পরস্পর মীরাছ লাভ করতে পারবে না। কেননা হাদীছে উল্লেখ হয়েছে যে, (لا يتوارث أهل ملتين شتي) "ভিন্ন দু'ধর্মের লোকেরা পরস্পর মীরাছ লাভ করতে পারবে না।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, দারেমী ও আহমাদ)

প্রশ্নমালা:

১) সূরা কাফেরূন নাযিল হওয়ার কারণ কি?

২) যে সকল স্থানে সূরা কাফেরূন পাঠ করা সুন্নাত, তম্মধ্যে দু'টি স্থান উল্লেখ কর দলীলসহ।

৩) সূরা কাফেরূনের ফযীলতের ব্যাপারে একটি দলীল উল্লেখ কর।

৪) সূরা কাফেরূনের সাধারণ অর্থ লিখ।

৫) সূরা কাফেরূন থেকে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তম্মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর।

সূরা কাওছারের তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

সরল বঙ্গানুবাদঃ

১) নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। ২) তাই আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন। ৩) যে আপনার শত্রু সে-ই তো লেজকাটা নির্বংশ।

শানে নযূলঃ

সুদ্দী বলেন: আরবের লোকদের ধারণা ছিল, যখন কোন লোকের ছেলে সন্তান মৃত্যু বরণ করত, তখন তারা তাকে বলত: فلان بتر লোকটি নির্বংশ হয়েছে। যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ছেলেদের মৃত্যু হল, তখন শত্রুরা বলল: মুহাম্মাদ নির্বংশ হয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ "নিশ্চয় আপনার শত্রুই হল লেজকাটা নির্বংশ।"

শব্দ সমূহের অর্থঃ

শব্দ :	অর্থ :
الكوثر	কাওছার জান্নাতের একটি নদীর নাম। তাকেই বলা হয় হাওযে কাওছার। এর দৈর্ঘ হল এক মাসের রাস্তা বরাবর। প্রশস্ত হল এক মাসের রাস্তা বরাবর। তার পানি দুধের চাইতে সাদা, মধুর চাইতে মিষ্টি। তার পেয়ালার সংখ্যা হবে আকাশের তারকার মত অধিক ও উজ্জল। যে সেখান থেকে একবার পানি পান করবে সে পরবর্তীতে কখনই পিপাসিত হবে না। হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা বা এক প্রকার অচেতন ভাব দেখা দিল। তারপর তিনি হাঁসিমুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা প্রশ্ন

	করলাম, আপনার হাসির কারণ কি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তিনি বিসমিল্লাহ্ সহ সূরা কাওছার শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। অত:পর বললেন, তোমরা কি জান কাওছার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার রব আমাকে উহা প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। এটি একটি হাওয, যেখানে ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেস্তোগণ হাওয থেকে ফিরিয়ে দিবেন। আমি বলব: পরওয়ারদেগার! সে তো আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ বলবেন: আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন পথ ও মত অবলম্বন করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)
وانحر	নাহার মানে যবেহ করা। অর্থাৎ আপনার ছালাত ও কুরবানীকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করুন।
شانئك	আপনার শত্রু, আপনাকে হিংসাকারী।
الأبتر	বিচ্ছিন্ন, কাটা। অর্থাৎ নির্বংশ।

সূরার সাধারণ অর্থ:

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সম্বোধন করে বলছেন, নিশ্চয় আপনাকে আমি প্রভূত কল্যাণ ও অফুরন্ত নে'য়ামত দান করেছি। তম্মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে একটি নহর দান করেছেন, যার নাম হল কাউছার। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন, পরক্ষণেই তিনি আদেশ করেছেন তাঁর শুকরিয়া আদায় করার জন্য: **فصل لربك وانحر** "আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন।" এদু'টি ইবাদতের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এজন্য যে, তা হল সর্বত্তোম ইবাদত ও সর্বাধিক নৈকট্যদানকারী আমল। তারপর বলেছেন, আপনাকে হিংসাকারী, দোষারোপকারী ও শত্রুতাকারী, সে-ই সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন, সকল আমল থেকে বিচ্ছিন্ন, সব ধরণের স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি-ই প্রকৃত পক্ষে পরিপূর্ণ মানুষ। যার জন্য রয়েছে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সম্ভাব্য সব ধরণের পরিপূর্ণতা। তাঁর স্মরণ সবার উর্ধে, তাঁর সহযোগি ও অনুসরণকারীর সংখ্যা অগনতি।

প্রশ্নমালাঃ

১) সূরা কাউছারের শানে নযূল বর্ণনা কর।

২) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখ: **الكوثر، انحر ، شانئك ، الأبتر**

৩) সূরা কাউছারের সাধারণ অর্থ লিখ।

সূরা আল্ মাঊনের তাফসীর

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أرأيت الذي يكذب بالدين * فذلك الذي يدع اليتيم * ولايحض على طعام المسكين * فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون* الذين هم يراءون ويمنعون الماعون (سورة الماعون)

আপনিকি দেখেছেন ঐব্যক্তিকে। যে বিচার দিবসকে মিথ্যা ভাবে। সেতো ঐ ব্যক্তি যে এতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। সে মিসকিনকে খাদ্যদানের ব্যপারে কাউকে উদবুদ্ধ করেনা। দূভোর্গ ঐ সমস্ত নামাযীদের জন্য যারা স্বীয় নামায থেকে গাফেল থাকে। যারা লোকদেখানোর জন্য আমল করে। এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয় থেকেও মানুষকে বাধা দেয়।

শব্দার্থ **معاني الكلمات :**

শব্দ	অর্থঃ
بالدين	অর্থাৎঃ পুনরুত্থান, বিচার দিবস,পরকালকে তারা মিথ্যা জানে।
يَدُعُ	গলা ধাক্কা দেয়।
ولايحض	এবং অপরকে উৎসাহিত করেনা।
وَيْل	ধুমকী দেয়া, কঠিন শাস্তি, কারো মতে জাহান্নামের মধ্যকার একটি উপত্যকা।
ساهون	অর্থাৎঃ নামাযকে নষ্ট কারি,তার নির্ধারিত সময়কে পরিত্যগ কারি, তার রোকন্ আরকানে ক্রটি কারি।
يُرَاءُونَ	অর্থাৎঃ তারা কাজ করে মানুষকে দেখানো ও শুনানোর উদ্দেশ্যে।
المَاعُونَ	ইবনু মাসউদ বলেনঃ "মাঊন" হল ঐসমস্ত বস্তু যা পরস্পরে লেনদেন করে। যেমন কুড়াল, হাড়ি- পাতিল, বালটি প্রভৃতি। ইবনু আব্বাস বলেনঃ উহা বাড়ীর আসবাব পত্র। মুহাম্মাদ বিন কাব বলেনঃ উহা প্রত্যেক সৎ কাজকে বলা হয়।

সূরার সংক্ষিপ্ত অর্থঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি কি দেখেছেন ঐব্যক্তিকে যে পরকাল,পুনরুত্থান দিবসকে মিথ্য মনে করে। সে হল ঐব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধমক দেয়,এবং সে তার প্রতি রহম করেনা অন্তরের রুঢ়তার জন্য , এবং এজন্যযে সে

নানেকীর আশা রাখে আর না শাস্তিকে ভয় করে। অপরকেও সে মিসকিনকে অন্যদান করার প্রতি উদবুদ্ধ করেনা। আর নিজেতো তাকে অন্যদান করেই না।
এর পর মহান আল্লাহ ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে ধমক দিয়েছেন যারা নামাযকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করে।
সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম ওদের সম্পর্কে যারা নামায থেকে গাফিল। তদুত্তরে তিনি বলেনঃ ওরা হল তারা যারা নামাযকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করে। (ত্বাবারানী, ইবনু মারদুওয়াইহ্ ,বায়হাক্বী, আবূ ইয়ালা প্রভৃতি। (তবে বর্ণনাটি মাওক্বুফ হিসাবে বিশুদ্ধ। ইবনু আব্বাস থেকে ও অনুরুপ বর্ণনা এসছে) এটা তারা এজন্যই করে কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি গুরুত্ব দেয়না। সে কারণ তারা নামাযকে নষ্ট করে যে নামায সবথেকে বড় আনুগত্ব। এজন্যই আল্লাহ তাদের কে রিয়া কারিতা, রুঢ়তা ও নির্দয়তাপ্রভৃতি খারাপ গুণের সাথে বিশেষিত করেছেন। তারা না তাদের প্রতি পালকের ইবাদত ঠিক মত আদায় করে আর আর না তার সৃষ্টি কুলের প্রতি ইহসান করে। এমনকি তারা এমন বস্তু দেয়া থেকে বাধা দেয় যা দিলে তাদের কোন ক্ষতি হয়না যেমন ধার বা দান হিসাবে বাসন - পত্র,বালতি,কুড়াল প্রভৃতি দেয়া। তারা তাদের বখীলির তাড়নায় মাঊন পর্যায়ের বস্তু দিতেও বাধা দেয় তাহলে এর চেয়ে যা বড় সে বিষয়ে কিরুপ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।
আবূ হোরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন এই আয়াতের ব্যখ্যায়ঃ

ويمنعون الماعون

(এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয় থেকেও তারা মানুষকে বাধা দেয়।) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ উহা হল এমন বস্তু যা মানুষ পরস্পরে লেনদেন করে থাকে, যেমনঃ কুড়াল, হাড়ি-পাতিল ও ঐ জাতীয় বস্তু। (আবূ নুআইম, দায়লামী, ইবনু আসাকির)

এসূরা হতে প্রমাণিত (মাসায়েল) ঃ

১) পুনরুত্থান ও বিচার দিবস প্রমাণিত হয়েছে, আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, উহাকে মিথ্যা জানা কুফরী।

২) ইয়াতীমের সাথে নরম ব্যবহার,তার প্রতি লক্ষ রাখা, তাকে প্রতি পালন করা, তার উপর রুঢ়তা প্রদর্শন না করা।

৩) মিসকীনকে অন্য দানের ফযীলত ও সে ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান। যে তানা করে তার প্রতি নিন্দাবাদ।

৪) নামাযকে তার স্বসময় হতে বিনা ওযরে বিলম্বিত করা হতে ভিতি প্রদর্শন। আর যে ব্যক্তি তা করবে বিনা কারণে এমনকি তার সময় শেষ হয়ে যাবে সে ব্যক্তিকে জাহান্নামের অগুণের হুমকী প্রদান।
৫) রিয়া কারিতার প্রতি নিন্দাবাদ, এবং সমস্ত কাজ ও কথা মহান আল্লাহর জন্য নিরংকুশ করার অপরিহার্যতা।
৬) ভালো কাজ ও হালকা সম্পদ খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান। যেমনঃ কিতাব , বাসন পত্র, বালতি প্রভৃতি ধার দেয়া। কারণ যারা তা করেনা আল্লাহ তাদের কে নিন্দা করেছেন।
৭) নামাযে গাফেল থাকা ও নামায থেকে গাফেল থাকা উভয় কথার মধ্যে পার্থক্য। নামায থেকে গাফিল থাকার অর্থ হলঃ নামাযকে তার স্ব সময় থেকে বিনা ওযরে বিলম্বিত করা। আর এ ক্ষেত্রেই শাস্তির হুমকী এসেছে। আর নামাযের মধ্যে গাফলাতী (বা অনিচ্ছাকৃত ভূল) ইহা মানুষ মাত্রেই হয়ে থাকে। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকেও হয়েছে। আর ইহা নিন্দনীয় বিষয় নয়।

প্রশ্নমালা

১)নিম্নের শব্দগুলির অর্থ বলঃ

(يَدُعُ –وَيْل – يُرَاءُونَ –– المَاعُونَ)

২) সূরা আল্ মাউনের সংক্ষিপ্ত অর্থ লিখ।
৩)সূরা আল্ মাউন থেকে প্রমাণিত চারটি মাসআলা উল্লেখ কর।

সূচী পত্র

ভূমিকা----------১
ইলমে তাফসীরের সূচনা ও তার পর্যায় সমূহ ----------৫
প্রথম যুগঃ রেওয়াতের যুগ----------৫
দ্বিতীয় যুগঃ তাফসীর লিপিবদ্ধ করণের যুগ----------১২
সূরা নাছ্‌র এর তাফসীর----------১৫
সূরা মাসাদের তাফসীর----------১৭
সূরা কাফেরুনের তাফসীর----------২০
সূরা কাওছারের তাফসীর----------২৩
সূরা আল্‌ মাঊনের তাফসীর---------- ২৬
সূচী পত্র----------২৮